প্রথম অধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকাল

''শরীরে মায়ের দেয়া রক্তে মাত্র দুই ফোঁটা অন্ধকার লেগে
এরকম অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যাবে কখনো ভাবিনি।
হৃদয়ে উৎপন্ন কিছু উদভ্রান্ত অঙ্কুর
উড়ে যায় যেন লক্ষ শোকগ্রস্ত সবুজ বেলুন....
স্নানের সময় আংটি খেয়ে গেছে বৃহত্তম মাছ।''[১]

বাংলায় গেরাসিম লেবেদফের হাত ধরে নাটক ও নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত ঘটে। লেবেদফের পর উনিশ শতকে সম্ভ্রান্ত ধনী বাঙালিরা ইংরেজদের অনুকরণে নিজেদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য শৌখিন নাট্যশালা গড়ে তোলে। এখানে মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয় চলত। পরে এই শৌখিন নাট্যশালার অভিনয়ের প্রয়োজনেই বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসুর মতো মৌলিক নাট্যরচয়িতাদের আবির্ভাব ঘটে। এরপরেই বাংলায় পেশাদার নাট্যশালার সূচনা হয়। পেশাদার নাট্যশালায় যেমন বিনোদনের জন্য, অর্থ উপার্জনের জন্য নাটক মঞ্চস্থ হত, তেমনি স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চেতনা, ব্রিটিশ বিরোধী চেতনারও জন্ম দিয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক উল্লেখনীয়। এছাড়া নৃত্যগীত, গীতিনাট্য, ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকের জন্মও এখান থেকে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অতুল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের আবির্ভাবও এই সময়ে। তাঁদের নাটকের আঙ্গিক ও অভিনয় প্রকরণে শেক্সপিয়র, মলিয়র ও ভারতীয় নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটে।

এরই মধ্যে বাংলা নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন ঘটে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের মতো নাট্য জগতেও রবীন্দ্র প্রতিভার পরশে সোনা ফলতে থাকে। সারা জীবনে তিনি কাব্যনাটক, নাট্যকাব্য, সামাজিক নাটক, কৌতুক নাটক বা প্রহসন, নৃত্যনাট্য ও রূপক সাঙ্কেতিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তাঁর নাটকে প্রচলিত শেক্সপিয়র নাট্য রীতির প্রভাব দেখা যায়। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'গোড়ায় গলদ', 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এই পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক, সাংকেতিকতা ও ইমেজের ব্যবহার লক্ষ করা যায় এবং নাট্যদর্শনেরও রূপান্তর ঘটে। এর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রচনায় সক্ষম হয়েছিলেন। এই পর্যায়ে নাটকগুলির মধ্যে 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাট্যসত্তার প্রকাশ ঘটেছিল। এখানে রূপক সাংকেতিক এবং কবিতা একটা ব্যঞ্জনা নিয়ে গভীর সামাজিক চেতনা ফুটিয়ে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি সম্পর্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

''ধনবাদী সভ্যতার যে বিকৃত রূপ, যা মানুষকে ডিহিউম্যানাইজড করে তোলে, যা মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে, মানুষের যৌবনকে ধ্বংস করে, যা মানুষের প্রাণশক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, সেইরকম বক্তব্য, গভীর বক্তব্য তিনি নাটকের মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন, তা আমি অন্তত বিশ্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথের সময়ে কারুর মধ্যে পাইনি।''[২]

এরপর বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। জার্মান, ইতালির বিরুদ্ধে ভারতের শাসক ইংরেজও যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী সংঘের আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধতা ভারতের লেখক শিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষেও দেখা দিল। অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষ, মজুতদার, মুনাফাখোরদের কালোবাজারি, কৃত্রিম খাদ্যের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারতবাসীকে অন্ধকার গহ্বরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল। বেকারত্ব, হতাশা, মনুষ্যত্বের অবমাননা গোটা জাতিকে গ্রাস করল। জাতির এই দুঃসহ যন্ত্রণা সে সময় পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ফুটে উঠল না। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যকাররা তখনও বিনোদন সর্বস্বতায় ডুবে থাকলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের লেখক শিল্পীরাও সংঘবদ্ধ হন। ১৯৩৬ সালে 'সারাভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

১৯৪৩ সালের ২৫ মে তৎকালীন বোম্বাইতে 'Indian People's Theatre Association' বা 'গণনাট্য সংঘ' গঠিত হয়। গণনাট্য সংঘের মূল স্লোগান ছিল, 'শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্য শিল্প।' রোমান্টিকতার পরিবর্তে সামাজিক সংকট, অত্যাচারী-মুনাফাখোর-মজুতদারের স্বরূপ উন্মোচন করা, অর্থনৈতিক শোষণ ও তার পরিণাম স্বরূপ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ছবি এবং সবশেষে শোষিত নিপীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধতা, জাগরণ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম, শ্রেণিহীন সমাজের সম্ভাবনার রূপদান করা ছিল গণনাট্য সংঘের মূল উদ্দেশ্য। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকারেরা বাস্তবের দাবি মেনে গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে খাদ্যসংকট নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বাংলা রিয়ালিস্টিক নাটকের ধারায় যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। বিষয়বস্তু ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই 'নবান্ন' বাংলা নাটকের ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। দেব-দেবী, রাজা-রানি, জমিদার শ্রেণির চরিত্র ছাড়াও খেটে খাওয়া নিরন্ন কৃষক শ্রেণির চরিত্রদের নিয়েও যে নাটক হতে পারে 'নবান্ন'ই তার প্রথম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই গণনাট্য সংঘে ভাঙন দেখা গেল। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যশিল্পীরা গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর তাঁরা যে নাট্যপ্রচেষ্টা চালালেন অনেকেই তাকে নবনাট্য আন্দোলন বলে অভিহিত করলেন। অনেকে আবার গণনাট্য আন্দোলন থেকেই বাংলায় নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করেন। যাইহোক গণনাট্যে ভাঙনের কারণ হিসেবে পরস্পরবিরোধী নানা মতামত রয়েছে। বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক শ্যামল ঘোষের মতে—

''শিল্পের অন্বেষা মুক্তি। শিল্পের তাগিদেই মুক্তির সন্ধানে গণনাট্য সংঘের কিছু কর্মী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলো এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই এককোষ থেকে বহুকোষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ভিন্ন ভিন্ন নামে আলাদা আলাদা নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠল, অন্যপথে মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা চলতে লাগল। ...নাটকগুলো উক্ত রাজনৈতিক দলের উগ্র প্রচার কার্যে নিজেদের প্রকটভাবে জড়াতে দিল না। ফলে ভবিষ্যতে এদের কাছে কিছু শিল্পসম্মত প্রয়োগকর্ম আশা করা গেল।''[৩]

গণনাট্য সংঘ ভাঙার ভিন্ন ব্যাখ্যাও রয়েছে। স্বাধীনতার আগে যারা গণনাট্য সংগঠনে এসেছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বাধীনতার পর নতুন শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়ে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারল না। তাঁদের মধ্যে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর অনেক শিল্পী জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুখী, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সংস্কৃতি-শিল্প-সংগঠনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল। নাট্যসমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

''... গণনাট্য শিল্পীদের বেশ বড় একটি অংশ এর থেকে বেরিয়ে এসে অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে লাগলেন। শিল্প যে গণসংগ্রামের হাতিয়ার এমন ভাবনা তারা আর ভাবতেই পারলেন না। বরং থিয়েটারকে বিশুদ্ধ শিল্পের মোড়ক দিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন।''[৪]

নাট্য ব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্র গণনাট্য ছাড়ার প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য তুলে ধরেছেন—

''ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একরকম ভারসাম্য রচনা করবার প্রয়োজন সমাজে। ইচ্ছে মতো যে কোনো সিদ্ধান্ত ব্যষ্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাতে ক্ষতি হয় সমাজের। বলতে চেয়েছেন ব্যক্তিচিন্তাকে 'individualism' বলে তাচ্ছিল্য করে সবসময় উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। বলতে চেয়েছেন মনুষ্য সমাজে কোনো কোনো একক মানুষের আবিষ্কার সমাজকে মুহূর্তে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে! তাই ব্যক্তিচিন্তাও সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান!''[৫]

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের ফলে নানা নতুন রীতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনে একদিকে অনেকে সামাজিক দায়িত্বের প্রকাশ ঘটানোর কথা বললেন, ফলে নাটকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্লোগান এবং রাজনৈতিক অতিসরলীকরণও এসেছে, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উপলব্ধি নাটকের মধ্যে সঞ্চার করে দেওয়া।

অনেকে আবার নবনাট্যের ক্ষেত্রে সমাজের ইতিহাস বা সামাজিক নিয়মকে গুরুত্ব না দিয়ে, আধুনিক কালের সমস্ত নাটককেই নবনাট্য বললেন। শম্ভু মিত্র বলেছেন—

''নবনাট্য আন্দোলনের গোড়ার দিকে, বা আজও অনেক শিল্পীর ও শিল্পরসবেত্তা দর্শকের মনে এর মানে কিন্তু আলাদা। তাঁদের কাছে নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবন সম্পর্কে

আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে।

তাই, নবনাট্য আন্দোলনের নাটককে দেখাতে হবে ব্যক্তি ও সমাজের রূপ। আজ সারা পৃথিবীতে নাটকের এই সমস্যা নানাভাবে সমাধান করবার চেষ্টা হচ্ছে।"[৬]

ব্যক্তি ও সমষ্টি— দুটো রূপই নিজেদের দেশকাল অনুযায়ী নাটকের মধ্যে প্রকাশ করা যায়, শম্ভু মিত্র বাংলার নাট্যকারদের সেই কৌশল আয়ত্ত করতে বলেছেন। 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা'কে তিনি নবনাট্যের নাটক বলেছেন। 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' হয়ে বাংলা নাটক 'রক্তকরবী'তে পৌঁছেছে নবনাট্যের ফলেই। নবনাট্য আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে শম্ভু মিত্র বলেছেন—

"... সারা পৃথিবীর নাট্য-ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে নিজের মধ্যে জীর্ণ করে তাকে ব্যবহার করতে হবে। নবনাট্যের ক্ষেত্রে কোনো সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই নেই, ছোঁয়া-ছুয়ির বিচার নেই। এর উদ্দেশ্য শুধু মানুষের হৃদয়কে আর বুদ্ধিকে সুছন্দে বাঁধা।"[৭]

গণনাট্য ছেড়ে শম্ভু মিত্র 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বতন্ত্র পথের খোঁজে শম্ভু মিত্রকে অনুসরণ করে গোষ্ঠীভুক্ত হলেন বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বহুরূপী', 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি রবীন্দ্র নাটক এবং 'দশচক্র', 'ধর্মঘট', 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' প্রভৃতি বিদেশি নাটকের অনুবাদ প্রযোজনা করতে লাগলেন। 'নবান্ন'র দশবছর পর বহুরূপীর 'রক্তকরবী' (১৯৫৪) প্রযোজনা দেখে বাংলা থিয়েটারের দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছিল।

এরপরে বাংলা থিয়েটারে উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। উৎপল দত্ত একবছর গণনাট্যে থেকে পরে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' বা সংক্ষেপে 'এলটিজি' প্রতিষ্ঠা করেন। উৎপল দত্ত শুধু নাট্যকার ও নির্দেশকই ছিলেন না, ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ইতিহাস-সমাজ- রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর নাটকগুলি বিপ্লবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি নিজেকে শিল্পী নয়, 'প্রোপাগান্ডিস্ট' বলতে বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর নির্দেশনায় এলটিজি 'কল্লোল', 'ফেরারী ফৌজ', 'তীর', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'লেনিন', 'হিম্মতবাঈ', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করে। নৌবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কল্লোল' নাটক ছয়-এর দশকে বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

গণনাট্য ছেড়ে একের পর এক গ্রুপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর বিদেশী নাটকের সাঙ্গীকরণ প্রয়াস শুরু হয়। পিরান্দেল্লা, ব্রেখ্‌ট, বেকেট, ইওনেস্কো, ও' নীল, অলবি প্রমুখ বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে গ্রুপ থিয়েটারগুলি। এই সময় কখনও বিদেশি নাটকের সরাসরি অনুবাদ, কখনও বা দেশীয় সমাজ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মূল নাটককে আত্মস্থ করে তার রূপান্তর, আবার ভাবানুবাদ প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। বিদেশী নাটক আত্মস্থ করে দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরে সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছিলেন 'নান্দীকার' (১৯৬০)-এর প্রতিষ্ঠাতা আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ, রূপান্তরিত ও প্রযোজিত নাটকগুলি হল— পিরানদেল্লার 'সিক্স কারেকটার ইন সার্চ অফ অ্যান অথার' অবলম্বনে

‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’, ‘হেনরি IV’ অবলম্বনে ‘শের আফগান’, ব্রেখ্‌টের ‘থ্রি পেনি অপেরা’ অবলম্বনে ‘তিন পয়সার পালা’ প্রভৃতি।

ষাটের দশকের শুরুতে বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ (১৯৬৩) নাটকে বিষয়, প্রকরণ, চরিত্র, সংলাপের অভিনবত্বে বাংলা নাটকে নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময়ই ষাটের দশকের প্রধান কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১ জুন ১৯৩৬ (সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯৩৪) খ্রি: পূর্ববঙ্গের বরিশালে। মা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়, বাবা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৭ খ্রি: দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে সপরিপারে তাঁরা কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। স্বদেশ ছেড়ে আসার পর কলকাতা শহর ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে বৃন্দাবন বসাক লেন পর্যন্ত শুধু স্কুলে যাওয়া আসার পথটুকু ছিল তাঁর পরিচিত। ছোটবেলায় থিয়েটারের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। ক্লাস সেভেন থেকেই তাঁর লেখালেখি শুরু।

ছোট্ট বয়স থেকেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় খুব বই পড়তেন। সেই সময় কলকাতায় তাঁদের বাড়ির কাছে বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটারের পাশে ছিল চৈতন্য লাইব্রেরী। তিনি ছোট্ট বয়সে সেই লাইব্রেরির সদস্য হয়েছিলেন। সেই লাইব্রেরিতে দেশি-বিদেশী অসংখ্য ভালো বই ছিল। তাঁর বই পড়া এবং বই নির্বাচন দেখে লাইব্রেরিয়ান সেই ছোট্ট বয়সেই তাঁকে লাইব্রেরি পারচেস কমিটির সদস্য করতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি রাজি হননি। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনাটা তাঁকে খুব উৎসাহ জুগিয়েছিল। তিনি সেই সময়ের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ‘‘তখন ক্লাস টেনে পড়ি। লাইব্রেরির ক্যাটালগে দেখলাম ‘সিক্স কারেক্টারস্ ইন সার্চ অফ এন অথর’ বইটা। নিলাম, পড়লাম। পিয়ার দেলো কে? জানি না। পুরো বইটা যে খুব বুঝতে পেরেছিলাম এমনও না। কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল।’’[৮]

এইভাবে কয়েক বছর কাটার পর ১৯৫০ সালে তিনি মেট্রিকুলেশন পাশ করে সিটি কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন।

উত্তর কলকাতার সিটি কলেজে তিনি বাংলা অনার্স নিয়ে বি.এ.তে ভর্তি হন। কলেজে পড়তে এসে তিনি যেন এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হন। বাইরের যে জগত ছিল তাঁর কাছে অচেনা— তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় গড়ে উঠতে থাকে। সহপাঠীদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পালের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব। কলেজে পড়ার সময়েই তিনি তাঁদের সঙ্গে কবিতা লেখা শুরু করেন। সেই চৈতন্য লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় থেকেই তিনি প্রচুর কবিতার বই এনে পড়তেন। বিশেষ করে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসুর গদ্য কবিতায় ডুবে থাকতেন। প্রথমদিকে গল্প উপন্যাস লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকলেও কবিতাকেই তিনি প্রকৃত ভালোবেসেছিলেন। সিটি কলেজের ‘সংকলন’ নামে পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করতেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাবা, মা, ছয় ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে কলকাতায় একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে খুব কষ্ট করে থাকতেন। সেই সময় তাঁদের মতো লক্ষ লক্ষ বাঙালি ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উদ্বাস্তু হয়ে ছুটে এসেছিলেন। এই উদ্বাস্তুরা অভাবে, ক্ষুধায়, যন্ত্রণায় যেভাবে কলকাতায় দিনযাপন করত, তা কিশোর মোহিতের মনকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করত। তাঁদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের রসদ জোগাত। এইরকম এক মৃৎশিল্পীকে নিয়ে তিনি একবার একটা গল্প লিখেছিলেন। পূর্ববাংলায় তাঁদের মফস্বল শহরে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রতিবছর এক মৃৎশিল্পী প্রতিমা তৈরি করতে আসতেন। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> ''আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে এই প্রতিমা গড়া দেখতে যেতাম। খড় বাঁধা, একমেটে, দোমেটে, তারপর রঙ করা, এরকম নানা স্টেজ পেরিয়ে আসতো দৃষ্টিদান, ওটা ছিল আমার কাছে সব থেকে আকর্ষক। যেদিন চোখ আঁকা হত সেদিন ছিল অত্যন্ত উত্তেজনার। এই দৃষ্টিদান আমাকে প্রথম বুঝতে শিখিয়েছিল যে চোখ হচ্ছে যে কোন expression-কে বোঝানোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যখন কোনও অভিনয় দেখি, আমি অভিনেতা অভিনেত্রীদের চোখের মধ্যে চরিত্রচিত্রণের অভিব্যক্তিটা খুঁজি। একটা খুব চলতি কথা আছে না যে চোখ মনের দর্পণ— এই কথাটা কিন্তু আমি সত্যিই ওই দৃষ্টিদান পর্বে উপলব্ধি করতাম।''[৯]

এই মৃৎশিল্পীরা এখানে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? কে তাদের চিনবে? কে তাদের প্রতিমা গড়তে দেবে? এই ভাবনা থেকেই তিনি কিশোর বয়সে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পটি তাঁদের কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখালে তিনি গল্পটি কলেজ ম্যাগাজিনে ছেপেছিলেন।

স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি প্রাইভেটে এম.এ. পাশ করেন। এম.এ. পড়তে পড়তে তিনি আয়কর বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তারপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫৯ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৯৬৬ সালে জঙ্গীপুর কলেজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখা শুরু। তিনি প্রথম জীবনের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> ''শুরুতে কেবল কবিতা-ই লিখতাম। সময়টা ছিল ১৯৫০-এর দশক। তখন কবিতার মায়াবী প্রণয়ে আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি। কবিতা লেখা আর কবিতা পড়া—কী প্রবল টান ছিল তার। Then we have been eating poetry and ink ran from the corners of our mouth. গদ্য লেখার মন চাইত না। ভেতরে অহংকার Maugham-এর কণ্ঠস্বরে বলতে চাইত— "The writer of prose can only step aside when the poet passes."[১০]

১৯৫৩ সালে একদল তরুণ কবি ও গল্পকার 'কৃত্তিবাস' নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে

যুক্ত ছিলেন এবং অচিরেই তিনি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর প্রধান কবি হয়ে ওঠেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''কবিতা রচনার সময় সে ছিল সর্বাঙ্গীণ রোমান্টিক। তখন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দের কবিতা ছিল আমাদের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতন, তার নিচে আমরা শিশুর মতন খেলা করতাম। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করে আমরা সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। মোহিত সেই পত্রিকার একজন প্রধান কবি ছিল। উঁচু গলার দিকে ঝোঁক, চমকানো শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা; মোহিতের কবিতা শান্ত, নিচু গলার, কিছুটা বেদনার্ত।''[১১]

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচিত মোট চারটি কাব্য গ্রন্থ, চারটি কাব্যনাট্য এবং তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির হল— 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' (১৯৫৬), 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (১৯৬১), 'অঙ্কন শিক্ষা' (১৯৬০-'৬১), 'শবাধারে জ্যোৎস্না' (১৯৬৫)। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল— 'জ্যোৎস্নায় নিদ্রিত ফুল' (১৯৬৪), 'চৈত্রের উড়ন্ত ফুল' (১৯৬৫), 'বিমলেন্দুর জীবন' (১৯৬৭)। এছাড়া তাঁর কাব্যনাট্যগুলি হল— 'দুঃস্বপ্ন', 'পদশব্দ', 'মহারাজ', 'রঙিন কাঁচ'।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ছিলেন আদন্ত একজন কবি। তিনি আকণ্ঠ কবিতাতেই ডুবে থাকতেন। কখনও কখনও থিয়েটার দেখলেও নাটক লেখার কথা কোনদিন ভাবেননি। তবে তিনি দেশি-বিদেশী প্রচুর নাটক পড়তেন। বই পড়ার জন্য তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল সহ বহু লাইব্রেরিতে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতেন। পড়তে পড়তে একসময় তিনি উপলব্ধি করলেন বহু নাটক আছে যেখানে কবির কবিত্বশক্তি অনায়াসে প্রকাশ করা যায়। তাই নাটকের সঙ্গে কবিতার খুব একটা দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু বাংলা নাটকে তিনি প্রথানুগত্য দেখতে পেলেন এবং রিয়ালিজমের বাইরে বাংলা নাটকের অভাব বোধ করলেন। যদিও তাঁর কাছে—

> ''থিয়েটার একটা আবিষ্কার, থিয়েটার যে নানামুখী, থিয়েটারের যে শত সহস্র পাঠ রয়েছে এবং কীভাবে একটা জীবন্ত অডিও ভিসুয়াল মিডিয়া ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন আবিষ্কারের জগৎকে নিয়ে আসে এইগুলো আমি আমাদের থিয়েটারে আছে বলে মনে করতাম।''[১২]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখতে গিয়ে হঠাৎ একসময় কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি ছিল, তা পরবর্তীতে তাঁর নাটক লেখার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। কবিতা কীভাবে তাঁর নাটক রচনায় সাহায্য করেছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> ''একজন কবির মনের মধ্যে যে কল্পনার জগৎ থাকে, একটা আলাদা কণ্ঠস্বর, আলাদা চোখ, আলাদা মন তৈরি হয়ে যায়, সেই মন, কণ্ঠস্বর যা কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি অর্জন করেছিলাম সেটাকেই পুঁজি করে নাটক লেখার চেষ্টা করলাম ও লিখে ফেললাম।''[১৩]

তাঁর নাটকগুলো সম্পূর্ণ তাঁর সৃষ্টি এবং নাটক লেখায় তিনি কোন রকম প্রথাসর্বস্বতার পথে হাঁটেননি

বলে মনে করেন। কিন্তু কবিতা রচনায় তাঁকে প্রথার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নাটক তাঁর একশোভাগ নিজের জায়গা এবং নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল অত্যন্ত বেশি।

এই কবিতা আর নাটক প্রথমে দুটোই তিনি পাশাপাশি লিখতে থাকলেন। এইভাবে তাঁর রচিত নাটক একসময় মঞ্চস্থ হতে থাকে। প্রথাসর্বস্বতার বাইরে বাস্তবতার উর্দ্ধে লেখা তাঁর নাটকগুলিকে ঘিরে নির্দেশক, দর্শকদের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। যদিও এর মধ্যে অনেক চড়াই-উতরাই আছে। প্রথম দিকে তাঁর নাটক দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে তেমন আকর্ষণ তৈরি করতে পারেনি। ধীরে ধীরে বহু আপস-মীমাংসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা সম্ভব হয়েছে। যাইহোক নাটককে তিনি যতটা আপন করতে পেরেছিলেন কবিতাকে ততটা আপন করতে পারেননি। যা তাঁর নিজের নয়, তা নিয়ে তিনি সময় নষ্ট করতে চাননি। এই কারণে নাট্যকার হয়েও তিনি কখনো নাটক নির্দেশনা করেননি। যদিও নাটক নির্দেশনার অনেক সুযোগ ও আহ্বান তিনি পেয়েছিলেন, অনায়াসে নির্দেশনাও করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন— ''নাটক সম্পর্কে যে দৃঢ় ধারণা বা কনসেপ্ট আমার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল বলে আমি ভেবেছি, সময় দিয়ে কাজ করেছি, নাট্যপরিচালনা সম্পর্কে আমার সেই দৃঢ়তা ছিল না।''[১৪]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন কবিতা না লেখা মানেই কবিত্বকে বিদায় দেওয়া নয়। কবিতা ছাড়াই কবিতাকে নানাভাবে বহন করা যায়। তিনি মনে করেন—

> ''একটা কবিতার থেকে কবিত্ববোধ অনেক বেশি বিস্তৃত। কবিত্ববোধের প্রকাশ যেমন কবিতার মধ্যে, তেমনি এই কবিত্ববোধ না থাকলে নাটকের গভীরতাও সৃষ্টি হয় না। ... আমার কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় নাটকের প্রবণতা, নাটকীয়তা, নাটকীয় মনের আনাগোনা আছে। কবিতার মধ্যে বিভিন্ন সিচুয়েশন চলে আসে এবং সেগুলো ড্রামাটিক, কতগুলো চিত্রকল্প তৈরি হয়। যার মধ্যে নাট্যক্রিয়া রয়েছে এবং একজন নাট্যকারের মন তার মধ্যে কাজ করেছে। নাটকের একটা ঝাপসা ভূমিকা কবিতার মধ্যে তৈরি ছিল এবং তারপরই নাটক লিখতে থাকলাম।''[১৫]

কবিতার মধ্যে তিনি নিজেকে খুঁজছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। যদিও তখন পূজা সংখ্যা এবং কাগজগুলিতে কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। তাঁর বন্ধুরাও তখন কবি হিসেবে বড় বড় জায়গায় পরিচিতি পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ করছিলেন কবিতা তাদের মধ্যে থেকে যেন হারিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেছেন— ''একে আমি মনে করতাম শবকাম, মৃতের উপর বসে সাধনার চেষ্টা, আমি নামধাম চাইলেও, ওইসব কামে থাকতে চাইছিলাম না।''[১৬]

তিনি তখন নানাভাবে নিজেকে খুঁজছিলেন। সৃষ্টির জন্য একটা অস্থির, অসহনীয় মানসিক অবস্থায় ছটফট করতেন। তখন তিনি দেশি-বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাটক সব বিষয়েই প্রচুর পড়াশোনা করতেন। পড়তে পড়তে তিনি আবিষ্কার করলেন এমন এক ধরনের নাটক আছে যেখানে একজন

নাট্যকার ও কবি পাশাপাশি সহাবস্থান করেও বাঁচতে পারে। তিনি এইভাবে নিজের সংকটটা বুঝিয়েছেন—

> ''আমার সংকটটা ভাবুন— আমি যদি কবিতাকে ছেড়ে যাই। যাওয়া কি সম্ভব? একজন ভীষণ ভালবাসার প্রেমিককে পেছনে ফেলে রেখে চলে যাওয়া খুব কঠিন। ... আমি তখন সেই ঘরবাড়ি খুঁজতে খুঁজতে কোথায় নিয়ে সেই প্রেমিকাকে রাখি, থাকা যায়— করতে করতে দেখলাম এক ধারার নাটক আছে যেখানে একজন কবি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতে পারে। সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু কবিতার সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক রাখা যায়, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে আগের মতো করে দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হেসে হেসে কথা হতে পারে। ইঙ্গিতে, সংকেতে— হালকা ছোঁয়ায় গভীর মুহূর্ত একটা টংকার দিয়ে জেগে উঠতে পারে। আমি তখন নাটক লিখতে আরম্ভ করলাম।''[১৭]

তাই কবিতা লেখা ছেড়েছেন বলে তার মধ্যে কোন আপশোশ ছিল না। তাঁর সমগ্র সত্তা একজন কবির। চাইলেও তিনি কবিতার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। তিনি নিছক কবি হিসেবে নিজের নাম টিকিয়ে রাখার জন্য কবিতা লিখতে চাননি। তিনি মনে করেন তাঁর কবিতা থেকে নাটকে আসার স্তরটাও খুব জটিল বা সংঘাতপূর্ণ ছিল না। কেননা প্রচলিত ধারার বাস্তববাদী নাটকের পরিবর্তে মানুষের অন্তর জগতকে নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। আর কবিতা মানেই অন্তর জগতের প্রকাশ।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে প্রথমে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে মোট সাত বছর ছিলেন। এই সময়ে কবিতা ও নাটক পাশাপাশি লিখছিলেন। কিন্তু নাটক রচনাতেই বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৬৬ তে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে আসেন এবং ১৯৭২-এর পর আর কবিতা লেখেননি। ইতোমধ্যে 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় তাঁর 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩, শারদীয়) ও 'নীলরঙের ঘোড়া' (১৯৬৪, শারদীয়) প্রকাশিত হয়। বন্ধু হওয়ার সূত্রে এই সময় বিখ্যাত নাট্যনির্দেশক শ্যামল ঘোষ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকার হয়ে ওঠার উন্মেষ মুহূর্তগুলো সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন এবং গন্ধর্ব পত্রিকায় তাঁর নাটকগুলো প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারপর শ্যামল ঘোষ 'গন্ধর্ব' ছেড়ে দিয়ে 'নক্ষত্র' নামে নতুন নাট্যদল গঠন করেন। শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় 'নক্ষত্র' নাট্যগোষ্ঠী ১৯৬৫ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর রঙমহল থিয়েটারে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে এটিই প্রথম থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। শ্যামল ঘোষ জানিয়েছেন—

> ''পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সবাই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন নবীন নাট্যকারকে। সেই শিরোপা মাথায় নিয়ে এভাবেই বাংলা থিয়েটারে কবি মোহিতের বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে দর্পিত পদক্ষেপ শুরু হল।''[১৮]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় শ্যামল ঘোষ সহ তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের উদ্দেশ্যে 'বটের পাতা' কবিতা লিখেছিলেন—

> ''বন্ধু নিয়ে ঘর করেছি, অন্য কোন ঘর ছিল না—
> একটা বটের পাতায় চেপে দশ জনেতে ভেসে গেছি।
> হাল ছিল না, হাত বাড়ালে হাতের মধ্যে হাত পেয়েছি।''[১৯]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন শ্যামল ঘোষ। 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'সোনার চাবি', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা', সোক্রাতেস' এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে তিনি বাংলা থিয়েটারে নতুন নাট্যরীতির পথ তৈরি করেছিলেন এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার নাট্যমোদী দর্শকের কাছে পরিচয় করিয়েছিলেন কিমিতিবাদী নাট্যকার হিসেবে। নাট্যকার জানিয়েছেন 'কিমিতি' শব্দটা প্রথম শ্যামল ঘোষ বলেছিলেন। শ্যামল ঘোষ বিভিন্ন জায়গায় অ্যাবসার্ড নাটকের কথা বলতে গিয়ে 'কিমিতি' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞাপনেও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটককে 'কিমিতিবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হত। শব্দটা আকর্ষক হওয়ায় সবাই এই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছিল। তারপর থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটককে সবাই 'কিমিতিবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু নাট্যকার নিজে কোন নির্দিষ্ট নামে তাঁর নাটককে সীমায়িত করতে চাননি কখনো। তিনি বলেছেন—

> ''What is it? এটা কীর নাটক। দর্শক উত্তরটা বানিয়ে নেবে। কারণ কিমিতিকে ভাঙ্গলে হচ্ছে কিম+ইতি অর্থাৎ একা কী? আর এটাই আমরা বলবো উদ্দেশ্যটা আমাদের এমনই ছিল।"[২০]

কিন্তু ধীরে ধীরে অ্যাবসার্ডের প্রতিশব্দ হিসেবে 'কিমিতি' শব্দটা বাংলায় চালু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন—

> ''আমি বারবার নানা জায়গায় বলেছি, একটা নাটক তখনই অ্যাবসার্ড হয় যখন তার মধ্যে 'ফিলোজফি অফ অ্যাবসার্ড' নাটকে বহিঃতত্ত্ব আছে, কিন্তু আমার নাটকে তার উল্টোটাই ছিল, বরং আমি বহিঃতত্ত্বকে ভিতরতত্ত্ব করার কথাই বলতাম।"[২১]

শ্যামল ঘোষ তাঁর 'স্মৃতি সত্তা নাট্য' গ্রন্থে 'কিমিতি' নাটক সম্পর্কে পরিচয় করিয়েছেন—

> ''কিমিতি হচ্ছে অসংগত বা illegitimate নাটক। নৈতিক কারণে নয়, দৃশ্যত বা বোধগম্যতায় যা বাস্তব তার নিদারুণ ও বিপুল অবাস্তবতা লক্ষ করে এই নাটকের পরিস্থিতিগুলো পরিহাস করে জীবনের পরিচিত অবস্থাকে। কেননা পরিহাস ও কর্মবিরতি ছাড়া বিরোধিতা জানবার আর কিছু নেই আবদ্ধ মানুষের কাছে। জীবনের সহজ বাস্তব এবং যুক্তির শেকলে বাঁধা যে বাস্তবের সঙ্গে আমাদের লেনদেন চালাতে হচ্ছে তাদের মধ্যে যদি জরুরি ফারাক থাকে তবে তাকে নিয়ে পরিহাস করা Cynicism নয়, বরং এক ধরনের জীবন চাঞ্চল্য বা positive লক্ষণ। এই গতি ও গতিহীনতার অন্তর্নিহিত অর্থে সহজ ও অন্তরঙ্গ উত্তরণই কিমিতি নাটকের ট্র্যাজিক হিউম্যানিজম। ... কেননা বাস্তবতাকে অর্থহীন জানার কারণে মানুষের কর্মবিরতি ও বিরোধিতাও সিরিয়াস ও বিরামহীন।"[২২]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা থিয়েটারে বিষয়ের নতুনত্বে, চরিত্রের উদ্ভটতায়, সংলাপের কাব্যিক মাধুর্যে, নাগরিক বুদ্ধি ও কৌতুকে, শুধু নাটকের ক্ষেত্রেই নয় মঞ্চ, অভিনয় সবক্ষেত্রেই এক অদ্ভুত থিয়েটারি প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। নাট্যসমালোচক, দর্শক-পাঠকরা তাঁর নাটকে

বেকেট্, আয়োনেস্কোকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর নাটককে কখনো 'কিমিতি', কখনো 'অ্যাবসার্ড' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছিল। কখনো আবার প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, সংগ্রামের রাজনৈতিক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাঁর নাটকের আগন্তুক চরিত্রের আগমনে বাংলা নাটক যেন নতুন দেশের এক যাদুকরকে খুঁজে পেয়েছিল। যার যাদুকাঠির আলতো ছোঁয়ায় আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বোধগুলো যেন উল্টেপাল্টে গিয়ে একটা নতুন বোধ ও বোধির জন্ম দিয়েছিল। তাঁর নাটক কখনো কবিতাকে ছুঁতে চেয়েছে আবার কবিতা কখনো নাটককে ছুঁতে চেয়েছে। একে অপরের যাদুময় ছোঁয়ায় জন্ম হত নতুন সৃষ্টির। সেই সৃষ্টির যাদুতে পাঠক, দর্শক, সমালোচক যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ত। তাঁর মৃত্যু সংবাদ নাটকের আগন্তুক লোকটি সম্পর্কে নীরেন বাবু যা বলেছিলেন, তা যেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—

> ''নীরেন ।। একটা হিপ্‌নোটিক স্পেলই তো চাইছিলুম হে। একজন ম্যাজিশিয়ানের অপেক্ষাই তো করছিলুম— যে শূন্যের থেকে ফুল এনে দেখাবে, অন্ধকারে হাত ঢুকিয়ে পায়রা এনে হাজির করবে, যাদুদণ্ডের একটু নাড়ায় এই পরিচিত পৃথিবীর বোধগুলোকে অথর্ব করে আর একটা আচ্ছন্ন পৃথিবী জাগিয়ে তুলবে।''[২৩]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিরা যা বলেছিলেন তা হল নিম্নরূপ:

কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত:

> i. ''আমাদের সময়ের পাপ ও ক্ষয়কে প্রায় আড়াই দশক আগেই ছুঁয়েছিল মোহিতের কলম।''[২৪]
>
> ii. ''মোহিতের মত অসামান্য সেন্স অফ হিউমার আমি এই গোটা জীবনে কারও মধ্যে দেখিনি। ও যখনই বন্ধু-পর্ষদে কথা বলত, প্রতিটি শব্দ আমরা শুধু শুনতাম না, গিলতাম। এমনকি নিজের দুর্দশা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ওর কোনো জুড়ি ছিল না। এসব কিছুকেই একাত্ম করে মোহিত তুলে রেখেছিল তার তুনীরে, যার অবিশ্বাস্য প্রয়োগ করল তার নাটকের অতিখ্যাত, অনণুকরণীয় সংলাপ রচনায়, বাংলা নাটকের ভোঁতা ভাঁড়ামো আর স্থূল কথাবার্তার গ্রাম্যতাকে বলা যায় একটা স্যুইপে পাল্টে ছিল মোহিত। তার সংলাপের সূক্ষ্ম অনুভব, নাগরিকতা, তীক্ষ্ণ রসিকতা, কবিত্ব বহুমাত্রিকতার বিশাল ডানার ছায়ায় একটা জনপদের মত জেগে উঠল নবনাট্য-নিরীক্ষার নানা সম্ভাবনা।''[২৫]

iii. নাট্যব্যক্তিত্ব ও সমালোচক অশোক মুখোপাধ্যায় : ''মোহিত চট্টোপাধ্যায় : একটি নাম : একটি মানুষ: একটি প্রতীক ... ভালো থিয়েটারের যা-যা শক্তির দিক্ সব মোহিতের মধ্যে দেখা যায়। নাটক সম্পর্কে শুধু মমতা নয়, সুগভীর বিচার। শুধু শুকনো পড়াশুনো না, তাকে রক্তের অন্তর্গত বোধে পরিণত করে নেওয়া।

আবার তিনি আশ্চর্য ব্যতিক্রমও। তিনি একমাত্র নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি একা, একক। তার কোনো

দল নেই। এ যুগে অন্য যে-কজন শক্তিশালী নাট্যকার মোহিতের আগে ও সমকালে কাজ করেছেন তাঁরা সবাই যুগপৎ নাট্যকার-প্রযোজক-অভিনেতা। ... মোহিত সে পথ মাড়াননি। কাব্য রচনা ত্যাগ করে নাট্য রচনার দুরূহ কাজে নিজেকে নিবেদন করার পর, সেই পথে একা হাঁটছেন তিন দশক। দলীয় নোংরামি, লোভ, সংঘের প্রতাপ-মত্ততা, অর্থ ও খ্যাতির পিছনে ইঁদুর দৌড়, এসবের থেকে একটু দূর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, একা।"[২৬]

সমকাল:

মোহিত চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সমাজ-রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন। তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনে সমকালীন সমাজ-সময়-রাজনীতির প্রভাব অপরিসীম। তিনি এক উত্তাল সমাজ-রাজনীতির আবহে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজে আমৃত্যু বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষা তাকে সমাজ রাষ্ট্রের সমস্যা গভীরভাবে পাঠ-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিল। নাট্যকার তাঁর যৌবনে যে সময়ের সাক্ষী ছিলেন সে সময়টা বাংলার ইতিহাসে 'অগ্নিযুগ' হিসেবে পরিচিত। অগ্নিযুগের তপ্ত আগুনে পুড়ে তাঁর মনন-মেধা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা- চেতনা-সৃজনশীলতা গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর নাটকের মধ্যে সেই সময়ের রক্ত, ঘাম, অশ্রু লেগে আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গের সময়টা এবং সবকিছু নতুন করে শুরুর যে আদর্শগত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টা তা তিনি শুধু স্বচক্ষে দেখেননি নিজেও সেই মহত্তর সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন প্রগতিশীল নাট্য সৃজনের দ্বারা। যুগজীবনের দ্বন্দ্বকে নাটকে ধারণ করে, যুগোপযোগী চরিত্র সৃষ্টি করে, নতুন চেতনা ও বোধের জন্ম দিয়ে তিনি এক দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করেছিলেন— অন্ধকার থেকে আলোর মহত্তর পথে যাত্রার জন্য।

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, ষাট ও সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতি ও আন্দোলন তাঁর জীবনে-সৃজনে-মননে-চেতনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজে ছিলেন ওপার বাংলার মানুষ। দেশভাগের সময় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ অসহায়, ভাগ্যহত মানুষের মতো তিনিও পরিবারসহ এপার বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি নিজে স্মৃতিচারণায় বলেছেন এই উদ্বাস্তু মানুষ ও তাদের জীবন তাঁকে নাটক রচনায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর নাটকে যে ভবঘুরে ও আগন্তুক চরিত্রদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাঁর শিকড়টা প্রোথিত ছিল এই উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনে। গৃহহীন, আশ্রয়হীন, দেশহীন, সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলোই তাঁর নাটকে একটু ভিন্নরূপে উপস্থাপিত। দেশচ্যুত ও আশ্রয়হীন হয়ে আগন্তুক, অদ্ভুত তথা উদ্ভট রূপে নাটকে তাঁদের আবির্ভাব— যাঁদের কোন পরিচিতি নেই— যাদের হাসি, কান্না, কথা, জিজ্ঞাসা, চিন্তা, কল্পনা, আচরণ, ভালোবাসা, স্মৃতি সমস্ত কিছুই আমাদের কাছে অচেনা ঠেকে। একটু আশ্রয়, একটু ভালোবাসা পেলে যারা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে— নতুন দেশে, নতুন ঠিকানায়, নতুন মানুষদের মাঝে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথমে অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ছিলেন, পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া (মার্কসবাদী)-র সঙ্গে যুক্ত হন। 'নিষিদ্ধ

দিক' কবিতায় তিনি বলেছিলেন 'সব দিকে, শুধু শোন্ যাসনে দক্ষিণে' তিনি বামপন্থীদের গভীর সংকটের দিনে, দক্ষিণপন্থী সরকার পক্ষের নানা প্রলোভনের মাঝেও কখনো আদর্শচ্যুত হননি। সিপিআই (এম)-এর সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকলেও তিনি নকশালদের পথ- আদর্শ-আন্দোলনকে যেভাবে নাটকে রূপ দিয়েছেন তাতে মনে হয় বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী জঙ্গি আন্দোলনের প্রতিও তিনি যথেষ্ট আকর্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের অনেক পূর্ণাঙ্গ ও ছোট নাটকে যার ছাপ রয়েছে। তাঁর নাটককে বিশ্লেষণ করার আগে তাই ষাট ও সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতি ও আন্দোলনকে নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে হবে।

১৯৪৭ সালে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভ করে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। এই ক্ষমতা ছিল সাধারণ ভারতীয়, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ শক্তি। সাধারণ ভারতীয় অর্থনৈতিকভাবে চিরপরাধীনই থেকে যায়। নব্বই শতাংশ মানুষের উপর দশ শতাংশ মানুষের শোষণ শুরু হয়। তাই ইংরেজ শাসনকালে ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য যেখানে ছিল জাতীয় মুক্তি অর্জন। সেখানে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আর্থ-সামাজিক- রাজনৈতিক বৈষম্য ও অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে মানুষ নতুন করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সজাগ হয়। সেই সময় বামপন্থী দলগুলোর লক্ষ্য ছিল, একটা কঠিন অথচ উচ্চতর মহান বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও সর্বহারার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা:

দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দুদের একদা নিজের দেশেই চোরের মতো পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সোনার ফসল, ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে বিনা অপরাধে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ বাঙালিদের হতে হয়েছিল ছিন্নমূল, অসহায়, উৎভ্রান্ত। সোনার দেশ ছেড়ে তাদের পাঠানো হয়েছিল জনমানবহীন, অনাবাদি, অনুর্বর ভূমিতে— পশুরও বাসের অযোগ্য ভূমিতে। একদিকে সবহারানোর বেদনা, বর্বর অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণের ভয়ঙ্কর স্মৃতি, অন্যদিকে সরকারের অসহযোগিতায় ভিখিরির মতো ছিল তাদের দিনযাপন। কমল চৌধুরী 'বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক' বইতে বলেছেন—

> ''একটি জাতিকে নিষ্ঠুরভাবে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র যে কত নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল তার প্রমাণ সেদিনের অন্ধকারময় ইতিহাস। বাঙালিকে সেদিন ছিঁড়ে খেয়েছে বাঙালি-অবাঙালি। তাদের পরিণত করা হয় জড়পিণ্ডে। অক্ষম, অপদার্থ, অলস এক জেনারেশন! যাদের কোনও ভূমিকা নেই বেঁচে থাকার কোনও দায়িত্ব নেই। মানুষের যাবতীয় সদগুণকে পিষে মারা হয়। ওদের পরিচয় হল উদ্বাস্তু।''[২৭]

সরকারি হিসেব মতো ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ। ১৯৯১ সালে আদমসুমারি অনুযায়ী উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এত সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমনের প্রধান কারণ ছিল, কলকাতা গ্রেট কিলিং-এর আতঙ্ক এবং পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য হিন্দু হত্যা। এছাড়া ১৯৫৩-তে উদ্বাস্তুর আসা বন্ধ করতে ভারত ও পাকিস্তান

পাসপোর্ট চালু করে। সেই সময়েও প্রচুর মানুষ পাকিস্তান ত্যাগ করে। ১৯৬২, '৬৪, '৬৫ তে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেও অসংখ্য মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসে। পূর্ববাংলা থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে যে ঘৃণা, ক্রোধ, যন্ত্রণা, অভিমান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, সহজেই তারা পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারত। ফলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হত এবং এর জন্য রাজনৈতিক উস্কানিও যথেষ্ট ছিল। অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বলেছেন—

> ''জনসংঙ্ঘ প্রথম শিকড় গেড়েছিল উত্তর-ভারতে। ... তার জন্য ঢের বেশি উর্বর মাটি ছিল দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আগমনে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষভাবে উদ্বাস্তু, ও সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ানো কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। ...।''[২৮]

দেশভাগের সময় পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বহু মুসলিম পাকিস্তানে বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় পাঞ্জাবের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলায় বারবার সে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মনের বাঙালি তা হতে দেয়নি, সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বাঙালি কখনো পরিচালিত হয়নি। কমল চৌধুরী বলেছেন—

> ''সেজন্য বাংলা গর্বিত এবং আজও ভারতবর্ষ দুনিয়ার সামনে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র বলে গর্বিত, তার আসল কারণ হল যে, পশ্চিম বাংলার মানুষ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব সম্পন্ন।''[২৯]

খাদ্য আন্দোলন:

দেশভাগের পর ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গ তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়ে। গ্রাম, শহরের সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মজুত ছিল, কিন্তু তার জন্য প্রকৃত মূল্যের থেকেও কয়েকগুণ বেশি মূল্য দিতে হত। এই খাদ্যসংকটের জন্য দায়ী ছিল মুনাফাখোর মজুতদারের কালোবাজারি। ব্রিটিশ ভারতে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকেই মূলত এই খাদ্যসংকট শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। স্বাধীনতার পর জোতদার, মজুতদার ও মুনাফাখোরদের দ্বারা সরকার পরিচালিত হচ্ছিল। এরই ফলে মজুতদারদের লালসা সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করেছিল। ফলে খাদ্যসংকট এত তীব্র আকার ধারণ করে। এছাড়া ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদেরও চাপ ছিল কিছুটা। এর পরিণতিতে ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণজোয়ারের রূপ লাভ করেছিল। পুলিশ মিলিটারির শত অত্যাচার সত্ত্বেও এই আন্দোলন দমন করা যায়নি। এই আন্দোলন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের গণভিত্তি শক্তিশালী হতে শুরু করে।

ষাট ও সত্তরের দশকে সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যসংকট এতটাই তীব্র হচ্ছিল যে তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সহ প্রত্যেকটি রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সংকট এতটাই তীব্র হতে থাকে যে ফসল ওঠার মুরসুমেও খাদ্যের আকাল দেখা দেয়। ১৯৫০ সালে, 'পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা

প্রায় ২ কোটি। দৈনিক আট ছটাক মাথা পিছু চালের হিসেবে প্রয়োজন ১১কোটি ১৩ লক্ষ মন, সরকারি হিসাব অনুযায়ী বীজ ধানের জন্য বাদ দিয়ে এবারে খাদ্যের জন্য চাল পাওয়া যাবে প্রায় ৫কোটি ৫ লক্ষ মন; প্রতি বৎসর (১৯৪৯-৫০) চাল উৎপাদন হয় মাত্র ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ মন।'[৩০] এই ঘাটতি খাদ্যাভাবের অন্যতম কারণ ছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর শুধু বাংলায় হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট দশকের খাদ্য সংকট সমগ্র ভারতেই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ৮০ জন খুন হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। গ্রেপ্তারের সংখ্যাটা প্রায় দুই হাজার জন। মোট দুই শতাধিক মানুষ নিখোঁজ হয়। এদের মধ্যে অনেকেই নিহত হয়েছিল। মোট তিন হাজার ব্যক্তি আহত হয়। তেত্রিশ আগস্ট এক লক্ষের বেশি মানুষের এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে বর্বরভাবে পেটায়। দশ সেপ্টেম্বর শহিদ দিবস পালিত হয়। '৬৩ সালে বসিরহাটে পুলিশের গুলিতে অনেকেই আহত হয়। বাংলা জুড়ে একদিকে উত্তাল খাদ্য আন্দোলন, অন্যদিকে পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণ ও গুলি চালনার ঘটনা চলতে থাকে। অবশেষে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে কারামুক্ত করা হয়।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের লাঠি, গুলি ও হিংস্র অত্যাচারে সামনে আন্দোলনকারীরা যে দৃঢ়তা, সাহস ও সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা এক কথায় স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ছিল অভূতপূর্ব। এই আন্দোলন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে, শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্লামেন্টারি সিপিআই, সিপিআই (এম) প্রভৃতি শরিক দলগুলি— যারা সেই সময় বামপন্থী গণ আন্দোলন পরিচালিত করেছিল; ভোটসর্বস্ব রাজনীতির লক্ষে সেই আন্দোলনগুলি পরিচালিত হওয়ায় সাময়িক কিছু দাবি আদায়ে সফল হলেও সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ব্যর্থ হয়।

ষাট ও সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতি ও আন্দোলন:

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) নেতৃত্বে অন্যান্য বাম দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে বামপন্থী শক্তি খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এরপর ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বড়সড় ভাঙন দেখা দেয়। যা ভারতের কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ত্বরান্বিত হলেও এর সূচনা বহু আগে ঘটেছিল। কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাও এই ভাঙনের মূলে দায়ী ছিল। সিপিআই-এর ভাঙনের মূল কারণ সম্পর্কে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সুকোমল সেন 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' (১৮৩০-২০১০) গ্রন্থে বলেছেন—

''দেশের শাসকশ্রেণি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসীয় দর্শনের বিপ্লবী নীতিগুলি সম্পর্কে

মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির মধ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সরাসরি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল।"[৩১]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে যে মতপার্থক্য, তথা যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট শাসক জোসেফ স্টালিনের মৃত্যু। ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ স্টালিনের মৃত্যুর পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনভার গ্রহণ করেন। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে রাশিয়ায় নিঃস্তালিকরণ (De-stalinization) প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

অমিতাভ চন্দ্র জানিয়েছেন, ''একই সঙ্গে ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত এই বিংশতিতম কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমদানি করলেন এক নতুন তত্ত্ব, যা 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা Three P's Thesis' হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। এই 'তিন পি-র তত্ত্ব' হল— i. শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ (Peaceful Transition to socialism) ii. ধনতান্ত্রিক- সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peacful co-existence with the capitalist states)। iii. ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Peaceful Competition with the capitalist Imperialist States). এই নিঃস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব' বা 'Three P's Thesis' আলোড়ন ফেলে দিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী অংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন এই নিঃস্তালিনীকরণ প্রক্রিয়া এবং 'তিন পি-র তত্ত্ব'। মাও সে তুং-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এর বিরোধিতা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বকে 'সংশোধনবাদী', 'সংস্কারপন্থী', 'ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণকারী' ইত্যাদি নিন্দাসূচক আখ্যায় আখ্যায়িত করলেন। চীনের মাও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হানলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব। শুরু হয়ে গেল ষাটের দশকের গোড়া থেকেই চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত সংগ্রাম, যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুপরিচিত হয়ে আছে 'Great theoretical Debate' বা মহান মতাদর্শগত সংগ্রাম নামে।"[৩২]

চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার এই তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত সংগ্রাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যেই এক অংশ হিংসার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পথে সংসদীয় ভোট-রাজনীতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা 'সোভিয়েতপন্থী' বা 'রুশপন্থী' নামে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তাদের অনেকটা মিল ছিল। অপর অংশ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তথা মাও সে তুং-এর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। যারা 'চীনপন্থী' বা 'বামপন্থী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত এই বিরোধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল।

আন্তর্জাতিক মতবিরোধকে সামনে রেখে ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব দেশের কমিউনিস্ট

আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করছিলেন। এর মধ্যেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তথা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস ও নেহেরু সরকারের প্রতি কমিউনিস্ট দলের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য ভারতের কোন কোন শ্রেণিকে নেতৃত্বে রাখা হবে তথা কোন কোন শ্রেণিকে নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করা হবে। তা নিয়ে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

এর ফলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে দুটো প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। এক অংশ চেয়েছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (National Democratic Front) গড়তে এবং অন্য অংশ চেয়েছিলেন জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (People's Democratic Front) গড়তে।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কেরলের পালঘাটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রবক্তারা চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি, পাতি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরি করতে এবং নেতৃত্ব হিসেবে তারা শ্রমিক ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে চেয়েছিলেন। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে নেতৃত্ব হিসেবে রাখার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের ভিতরের প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে আন্দোলনে কাজে লাগানো। এই কারণে নেহেরুকেও সমর্থনের কথা বলেছিলেন তারা। অন্যদিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমর্থকেরা শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি, পাতি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া শ্রেণিকে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা নেতৃত্ব হিসেবে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণিকে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের গঠনতন্ত্র	জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের গঠনতন্ত্র
শ্রমিক শ্রেণি	শ্রমিক শ্রেণি
কৃষক শ্রেণি	কৃষক শ্রেণি
পাতি বুর্জোয়া শ্রেণি	পাতি বুর্জোয়া শ্রেণি
জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি নেতৃত্ব	বুর্জোয়া শ্রেণি নেতৃত্ব
শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি	শ্রমিক শ্রেণি

১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় কুমার ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টির ভাঙন আটকানোর জন্য জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দাবিদার 'বামপন্থী' ই এস নাম্বুদ্রিপাদকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমর্থক 'দক্ষিণপন্থী' ডাঙ্গেকে চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হয়।

১৯৬২-এর অক্টোবর মাসে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মতবিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ভারত-চীন সংঘর্ষের কারণে সারা ভারতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের বন্যা বয়ে যায়। চীনকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতীয়দের মধ্যে উগ্র চীন বিরোধিতা দেখা যায়। এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণ-পন্থী নেতৃত্ব এই যুদ্ধে চীনকে দোষী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নেহেরুও ভারতরাষ্ট্রকে সমর্থন করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী' অংশ চীনকে সরাসরি

এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা থেকে বিরত থাকেন এবং ভারত ও চীনকে আলাপ আলোচনার শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। এই কারণে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী' অংশকে দেশদ্রোহী হিসেবে প্রচার করা হয়। এবং চীন বিরোধিতা পরিণতি পায় উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতায়। সারা ভারত জুড়ে কমিউনিস্টদের ধরপাকড় শুরু হয়। সংবাদপত্রে, রেডিওতে, পাড়ায়, রাস্তায় কমিউনিস্টদের অপমান, লাঞ্ছনা করা হয়। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির 'বামপন্থী'রাই মূলত সেই সময় 'দেশদ্রোহী' আখ্যা পেয়েছিলেন, কিন্তু 'দক্ষিণপন্থী' অংশের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল।

শেষপর্যন্ত ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই (এম) নামে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ১৯৬৪ সালে ৩১ শে অক্টোবর থেকে, ৭ নভেম্বর কলকাতায় পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বতন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিকতায় সিপিআই (এম)-এর প্রথম কংগ্রেস সপ্তম কংগ্রেস হিসেবেই পরিচিতি পায়। এই কংগ্রেসে পি সুন্দরাইয়াকে সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক এবং জ্যোতি বসু ও নাম্বুদ্রিপাদ-কে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে রাখা হয়।

কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে সিপিআই (এম) নেতৃত্ব ভারতকে একটি 'বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করেন। "It is a bourgeois-Lanlord state headed by the big bourgeois."[৩৩] সিপিআই-এর 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' ('Anti imperialist, anti-feudal people's democratic revolution')[৩৪] এর তত্ত্বের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য দেখা গেল না। সিপিআই নেতৃত্ব মনে করতেন, "Neheru Government represented not the bourgeois as a hole, but only the anti-imperialist anti feudal, progressive section of the Indian bourgeois"[৩৫] অন্যদিকে সিপিআই (এম) নেতৃত্ব কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে দেখতে পাননি। তারা কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল কোলাবোরেটর ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংগঠন বলে অভিহিত করেছিলেন।

খাদ্য আন্দোলনের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলগুলি যৌথভাবে সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। যে কোন দেশে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যুক্ত ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জনগণকে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া সংগঠন ও আদর্শ মুক্ত করার জন্য এবং প্রকৃত বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতির সংস্পর্শে আনার জন্য ও সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে সকলে সামিল হওয়ার ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। তেমনি প্রকৃত বামপন্থী তত্ত্ব, আদর্শ ও নেতাকর্মীর জীবনাচরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে।

'৬৭ সালের নির্বাচনে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অন্যদিকে বামপন্থীরা 'ইউনাইটেড লেফ্ট ফ্রন্ট' গঠন করেন। সেই ফ্রন্টে ছিল সিপিআই (এম), আর এসপি, এসএস পি, এস ইউ সি আই প্রভৃতি বামপন্থী

দল। এবং সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী দল মিলে প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠিত হয়।

> '' '৬৭ সালের নির্বাচনে ২৮৪ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১২৭ এবং দুই ফ্রন্ট মিলে পেল ১৫৩ আসন। দুই ফ্রন্ট একসঙ্গে হল— যুক্তফ্রন্ট। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ২ মার্চ শপথ নিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা।''[৩৬]

বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অজয় ঘোষের জন্য আট মাসের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নেন। এর ফলে বামপন্থী দলগুলো প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভ, মিছিল, ধর্মঘটের মাধ্যমে বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। তারপর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন অজয় মুখোপাধ্যায় এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তেরো মাস পর আবার কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। যাইহোক, যুক্তভাবে বামপন্থীদের দীর্ঘ গণআন্দোলনের ফলেই ৬৭' ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয়বারও যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার চক্রান্ত শুরু হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। বামপন্থীরা প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকেন বাংলা জুড়ে। বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ ও সংঘর্ষে প্রায় ২৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ঐ বছরের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে বাংলায় সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তাদের সরকার গড়তে দেওয়া হয় না। বাংলা কংগ্রেস এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল সিপিআই-এর সমর্থনে মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। বামপন্থীরা এই সরকারকে 'নীতিহীন সুবিধাবাদী পাঁচ মিশালি সরকার' বলে বিদ্রুপ করেন।

১৯৭০-৭১ সালে বাংলায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। বামপন্থীদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের সংঘর্ষ, বামপন্থীদের সঙ্গে নকশালপন্থীদের সংঘর্ষ, সিপিআই (এম)-এর সঙ্গে সিপিআই-এর সংঘর্ষ এবং সর্বোপরি সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে নকশালপন্থী ও বামপন্থীদের সংঘর্ষ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

১৯৭২ সালের ১১ মার্চ দিনটি বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই দিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থী জোটকে হারানোর জন্য সমস্তরকম হীন ও বর্বরোচিত পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই নির্বাচনে সিপিআইয়ের সমর্থনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন আরএসপি, এসইউসি, ফরোওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য বামপন্থী দল জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। রিগিং, গুণ্ডামি ও পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এই নির্বাচনে বামপন্থী জোটকে হীন

চক্রান্ত করে পরাস্ত করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই নির্বাচনেও সিপিআই-এর সমর্থনে কংগ্রেস বাংলায় সরকার গঠন করে। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

সিপিআই (এম)-এর গঠনের সময় থেকেই নেতৃত্বের একটা অংশের মধ্যে সিপিএমের গণআন্দোলনের লাইন এবং কর্মসূচী নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। তাঁদের মধ্যে সশস্ত্র জঙ্গি বিপ্লবের প্রতি একটা আবেগ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁরা সিপিআই (এম)-এর ভোট রাজনীতির মাধ্যমে সংসদীয় ক্ষমতা দখল ও সংস্কারমূলক তথা উন্নয়নমূলক কিছু জনদরদী কাজের মাধ্যমে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রকৃত রাষ্ট্রবিপ্লব— সশস্ত্র জঙ্গি কার্যকলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।

এরই মধ্যে ১৯৬৭ সালের মে মাসে চীনের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা মাও-সে-তুং-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়িতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল যা সমগ্র ভারতে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলন পরে সারা ভারতে 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়েছিল। এর ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, ''ক্ষমতায় এসেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বর্ষীয়ান সিপিআই (এম) কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার 'জমি থেকে ভাগচাষীদের উৎখাত বন্ধে'র কথা এবং 'ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বন্টন' করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৬৭ সালের ১৮ মার্চ দার্জিলিং জেলায় সিপিআই (এম) দলের শিলিগুড়ি মহকুমা কমিটি এক কৃষক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেছিল এবং সেই কৃষক সম্মেলন ''জমির উপর জোতদারদের একচেটিয়া মালিকানার অবসান ঘটিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কেড়ে নেওয়া জমি বন্টনের এবং জোতদার ও গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সশস্ত্র কৃষক সংগঠন গঠন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেইমত কাজও শুরু হয়েছিল। কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ সিপিআই (এম)-এর বিপ্লবী অংশ এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।''[৩৭]

এই সময় দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়াতে বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে একজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। একদিন পরে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে নকশালবাড়ির প্রসাদজোত গ্রামে বিদ্রোহী কৃষকদের উপর উন্মত্তের মতো গুলি চালাতে থাকে এবং দশজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। কৃষকরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু অচিরেই পুলিশ ভয়ঙ্কর দমন পীড়ন চালিয়ে নকশালবাড়ি অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন দমন করে।

এই সময় সিপিআই (এম) নেতৃত্ব উভয় সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন। যেহেতু তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন ছিলেন, তাই কেন্দ্র সরকার থেকে নির্দেশ ছিল কঠোর হাতে আন্দোলন দমনের জন্য। অন্যদিকে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বের বিপ্লবী অংশই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। শেষপর্যন্ত সিপিআই (এম) এই আন্দোলন দমনে পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করলেও সশস্ত্র জঙ্গি আন্দোলনের পথ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে।

কিন্তু সেই সময় চীনের কমিউনিস্ট সরকার নকশালবাড়ির এই সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁদের মতে এই আন্দোলন ছিল 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'।

এরপর দলের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য সিপিআই (এম) থেকে চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল সহ প্রায় ৪০০ জন পার্টি সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

এই সময় নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা ও শ্রীকাকুলামে, বিহারের মুশাহরিতে এবং উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে। তারপর ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী, লেনিনবাদী) বা সিপিআই (এমএল) নামে নতুন কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখেরা ছিলেন এই পার্টি গঠনের মূলে। চীন থেকেও সিপিআই (এম এল) দল গঠনের স্বীকৃতি মিলেছিল।

নকশালদের লড়াইয়ের কৌশলটা ভিন্ন ছিল। কিন্তু সিপিআই (এম) এর সঙ্গে খুব বেশি তত্ত্বগত পার্থক্য তাঁদেরও ছিল না। তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষ নামেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে। ভারতবর্ষ একটি 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক' রাষ্ট্র। একদিকে সামন্তপ্রভু অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বেনিয়ারা ভারত সরকার পরিচালনা করছে। অনেকটা চীনের অনুকরণে তাঁরা ভারতবর্ষের বিপ্লবের কৌশল ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যদিও সেই সময় চীনের সমাজ-অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের মৌলিক পার্থক্য ছিল। তৎকালীন প্রাক্‌বিপ্লব চীনের অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ গ্রামীণ এবং মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর, অন্যদিকে ভারতের অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতি। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্যও পুঁজিবাদী বাজারের পণ্য হিসেবে ক্রয়বিক্রয় হত। নকশালপন্থীরা দেশে কঠিন লড়াই আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবী দলের শক্তিবৃদ্ধি এবং গণসংগঠন গড়ে তোলার কোন চেষ্টা করেননি। তাঁরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের প্রতি ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-খুন হবে সর্বত্র। এই কৌশলগুলো নকশালরা গুয়েভারা, কাস্ত্রো, মাও-এর যুদ্ধ কৌশল হিসেবে প্রচার করেছিলেন। যদিও এর সঙ্গে তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক ছিল না। নিজেদের দেশের সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী তারা বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু নকশালরা নিজের দেশের সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বিচার না করেই বিপ্লবের নামে ব্যক্তি হত্যায় মেতে ওঠে, ফলে পরোক্ষে বিপ্লবেরই ক্ষতি হয়।

১৯৭১ সালে বরানগর ও কালীপুর থানা এলাকায় হত্যা, বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। রাতের বেলায় প্রচুর সেনাবাহিনী এলাকা ঘিরে ফেলে। অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ধারা জারি হয়। পুলিশ ও সেনার গুলিতে সরকারি মতে ১৭ জনের মৃত্যু হয়। সর্বত্র মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বহু মৃতদেহ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। বেসরকারি মতে খুন হয় ৪০ থেকে ৫০ জন।

নকশালরা শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজের সর্বস্তরে গণসংগঠন গড়ে তোলার পরিবর্তে শত্রু হত্যার (Theory of annaihilation) রোমান্টিক বৈপ্লবিক অভিযান শুরু করেন। শুধু তাই নয়, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, স্কুল, কলেজে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনার মাধ্যমে সর্বত্র একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেন। কিন্তু সুশীতল রায়চৌধুরী, অসীম চ্যাটার্জীর মতো নকশালপন্থী নেতারা অবশ্য নকশালদের

খতমের লাইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত প্রমুখ নেতারা খতমের মাধ্যমেই বিপ্লবের লক্ষ্যে এগোতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এরপরে নকশালদের উপরে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর বর্বর অত্যাচার নেমে আসে। সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী কায়দায় নকশালদের দমন করে পুলিশ ও মিলিটারি। নকশালীদের আইনসম্মতভাবে গ্রেফতার করে গণতান্ত্রিকভাবে বিচারের পথে না হেঁটে সরাসরি এনকাউন্টার করে হত্যা করা হয়। যারা ধরা পড়েন জেলে ঢুকিয়ে তাদের উপরেও নির্মম অত্যাচার করা হয়।

নকশাল আন্দোলন শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর আত্মত্যাগ ও সশস্ত্র সংগ্রাম ভোলার নয়। বর্তমান সময়ে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও একসময়ের জেলখাটা বিপ্লবী সংগ্রামী কিন্নর রায়ের মতে, ''নকশাল আন্দোলন চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখিয়েছিল।''[৩৮]

১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন চলাকালীন সময়ে বামপন্থী সমস্ত দলের নেতা-কর্মীদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের মে মাসে সারা ভারতে রেল ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। দেশজুড়ে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সমস্ত বিরোধী কণ্ঠ ও গণআন্দোলন দমন করা হয়েছিল।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনে সারা ভারতে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও পরাজিত হয়। কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৭ সালে ১২ জুন ও ১৪ জুন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বামফ্রন্টের সহযোগী ছিল আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দল। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৩১টি আসন লাভ করে বামফ্রন্ট।

তথ্যসূত্র:

১. 'প্রথম'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কবিতার দরজা খোলা রেখে প্রভাতকুমার দাস। সম্পাদক ড. তপনজ্যোতি দাস। রঙ্গপট ২০১২। কলকাতা। পৃ. ২৫৩।

২. প্রমা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। ২০১৩। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। কলকাতা। পৃ. ৩০।

৩. বহুরূপী চতুর্দশ-বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক গঙ্গাপদ বসু। প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৬২। কলকাতা। পৃ. ৯৮।

৪. দর্শন চৌধুরী। থিয়েটারে আন্দোলন। গ্রুপ থিয়েটার। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা। সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা। শারদীয় ১৯৭৮। কলকাতা। পৃ. ৩৮।

৫. গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্র। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫। আনন্দ। কলকাতা। পৃ. ৩৬

৬. প্রসঙ্গ : নাট্য। শম্ভু মিত্র। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১। পৃ. ১৩০

৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩১

৮. নাটক নিয়ে কথা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। অনুষ্টুপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। সম্পাদনা- দেবাশিষ সেনগুপ্ত। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। পৃ. ৯৬।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১০. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাস্তবতা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬। কলকাতা। পৃ. ৯।

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আবার কবিতায় ফিরবে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। কবিতা সংগ্রহ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২৯ ভাদ্র ১৪০০।

১২. নাটক নিয়ে কথা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। অনুষ্টুপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। পৃ. ৯৮।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৬. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আমার নাটক লেখা। রঙ্গপট নাট্যপত্র। নবম সংখ্যা। ২০১২। কলকাতা। পৃ. ৮১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।

১৮. বিমোহিত কথকতা। শ্যামল ঘোষ। আজকাল। ২০১৩। কলকাতা। পৃ. ২৯

১৯. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বটের পাতা সেলাই হয় না। পুস্তক বিপণি। প্রথম প্রকাশ ২৯ ভাদ্র ১৪০০। কলকাতা। পৃ. ১৮৩।

২০. নাটক নিয়ে কথা। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। অনুষ্টুপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। পৃ. ১০০

২১. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০০

২২. স্মৃতি সত্তা নাট্য। শ্যামল ঘোষ। প্রতিক্ষণ। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩। কলকাতা। পৃ. ১৬১

২৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১। কলকাতা। পৃ. ৯৭।

২৪. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য সংকলন। সমীক্ষণ। ২২ শে নভেম্বর ১৯৯০। কলকাতা। পৃ. ১৭৭।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।
২৭. বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক। কমল চৌধুরী। সংকলন ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী। পত্রভারতী। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯। কলকাতা। পৃ. ৮৬।
২৮. বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক দেশভাগের অভিশাপ দ্বিতীয় খণ্ড। সংকলন ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী। পত্রভারতী। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯। কলকাতা। পৃ. ৮৫।
২৯. স্বাধীনতা পঞ্চাশ পেরিয়ে। কমল চৌধুরী। পৃ. ১১৪।
৩০. বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক। কমল চৌধুরী। পৃ. ১৩৮।
৩১. ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০১০)। সুকোমল সেন। ২০১৫। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পৃ. ৪১০।
৩২. স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে। কমল চৌধুরী (সম্পাদনা)। স্বাধীনতা পরর্বতী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর-অমিতাভ চন্দ্র ১৪০৫। কলকতা। পৃ. ১০৪
৩৩. SHIBDAS GHOSH WHY SUCI IS THE ONLY GENUINE COMMUNIST PARTY OF INDIA । 25 September 2004। Ganadabi Printers & Publishers। Page 461 Kolkata।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ।
৩৫. The Political-Tactical line of the Communist Party of India (Marxist) (Excerpts from documets)। NBA। 1st Edition February 2015। Page-31। Kolkata।
৩৬. বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক। কমল চৌধুরী। পৃ. ২৪
৩৭. স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে। কমল চৌধুরী (সম্পাদনা)। স্বাধীনতা পরর্বতী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর-অমিতাভ চন্দ্র ১৪০৫। কলকতা। পৃ. ১১৪
৩৮. https.//m.facebook.com